লালগড়ে বাঘের মৃত্যু, প্রশ্নের মুখে বন দফতর

জীবজন্তুর প্রয়োজন পরিবেশ রক্ষার জন্য। এই কারণেই সারা বিশ্বে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ আইন প্রণয়ন হয়েছে। কারণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষায় জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী অপরিহার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ রাজ্য সহ সারা ভারতে চোরাশিকারীরা বন্যপ্রাণী নিধন করছে অবাধে। এদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিশ্বজুড়ে সশস্ত্র চোরাকারবারীরা। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যে হাতি, গণ্ডার, চিতা বাঘ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হত্যা চলছে। কিন্তু কার্যত কোনও প্রতিকার নেই। পাশাপাশি জঙ্গল এলাকা ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। জঙ্গল সাফ করে বসতি গড়ে উঠছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। বন দফতর নির্বিকার। সংবাদপত্র খুললেই নজরে পড়ে বাঘ ঢুকেছে লোকালয়ে। হাতি ঘুরছে শহরে। এর বড় কারণ বনাঞ্চল কমে আসছে। সংরক্ষিত বন কেটে ঘর-বাড়ি বানাচ্ছে মানুষ। এর ওপর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পশুদের খাবার নেই। খাবার চুরি হয়ে যাচ্ছে। তা বিকিয়ে যাচ্ছে বাজারে। বন্যপ্রাণীরা তাই পেটের দায়ে বেরিয়ে আসছে লোকালয়ে খাবারের খোঁজে। এভাবে কোনও জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে চলে এসেছিল লালগড়ে। প্রায় দেড়মাস ধরে তোলপাড়ের পর অবশেষে শুক্রবার লালগড়ের জঙ্গলে মিলল সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃতদেহ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরও বন দফতর বাঘটির খোঁজে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে, শিকার উৎসবের অছিলায় একদল লোক বাঘটিকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলল। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে!

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"এই রকম আছে যে, সেই **মহামায়া** শিবকে টপ্ করে খেয়ে ফেললেন। মা'র ভিতরে ষট্‌চক্রের জ্ঞান হলে শিব মা'র উরু দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন শিব তন্ত্রের সৃষ্টি করলেন।"

"সেই চিৎশক্তির, সেই মহামায়ার শরণাগত হতে হয়।"

ঈশান—আপনি কৃপা করুন।

(ঈশানকে শিক্ষা, 'ডুবে দাও'-গুরুর কি প্রয়োজন ? ব্রাহ্মণ পন্ডিত শাস্ত্র ও ঈশান-Mere Book Learning)

শ্রীরামকৃষ্ণ—সরলভাবে বলো হে ঈশ্বর, দেখা দাও , আর কাঁদ; আর বলো, হে ঈশ্বর, কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন তফাৎ কর!

"**আর ডুব দাও।** উপর উপর ভাস্‌লে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়? ডুব দিতে হয়।"

"গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। একজন বাণলিঙ্গ শিব খুঁজতে ছিল। কেহ আবার ব'লে দেয়, অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একটি গাছ দেখবে, সেই গাছের কাছে একটি ঘূর্ণি জল আছে, সেইখানে ডুব মার্‌তে হবে, তবে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।"

ঈশান—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন।** মানুষ গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হ'লেই সব হ'য়ে গেল! শুদ্র (একলব্য) মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণকে পুজা করতো, সাক্ষাৎ দ্রোণচার্য জ্ঞানে; তাইতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হ'ল।

"আর তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাখামাখি করো না। ওদের চিন্তা দু'পয়সা পাবার জন্য!" "আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ করছে। তা দেখেছি অর্দ্ধেক পাতা উল্টে যাবে।" (সকলের হাস্য)।

"নিজের বধের জন্য একটি নরুণেই হয়। পরকে মারতেই ঢাল-তরোয়াল– শাস্ত্রাদি।"

"নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই। যদি **বিবেক** না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্ শাস্ত্র পড়লেও কিছুহয়না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব করে দেবেন।"

দিনপঞ্জিকা

২বৈশাখ, ভাঃ ২৬ চৈত্র, **১৬ এপ্রিল,** ২ বহাগ, সংবৎ ১৫ বৈশাখ বদি, ২৮ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৪। **সোমবার, অমাবস্যা** দিবা ঘ ৭।২৩ মিঃ। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩৫ মিঃ। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ঘ ১১।২৮ মিঃ। নাগকরণ, দিবা ঘ ৭।২৩ গতে কিন্তুঘ্নকরণ, রাত্রি ঘ ৬।৫৪ গতে ববকরণ। **জন্মে**—মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ঘ ৩।৫৩ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **যোগিনী**— ঈশানে, দিবা ঘ ৭।২৩ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ঘ ৬।৫৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।৪৬ গতে ৪।২০ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১০।১২ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। **যাত্রা**— শুভ পূর্ব্বে দক্ষিণে ঈশানে ও বায়ুকোণে নিষেধ, দিবা ঘ ৬।৫৫ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৫৩ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ৭।২৩ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ঘ ৮।২৯ গতে অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন নৌকাচালন নৌকাযাত্রা ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন। **বিবিধ**—প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। **আমাবস্যার ব্রতোপবাস**। দিবা ঘ ৭।২৩ মধ্যে অক্ষয়া **(মৌনী) স্নানদানাদি। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৬।৫১ মধ্যে ও ১০।১৭ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৪৪ গতে ৮।৫৮ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।১০ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৩।২৫ গতে ৫।৮ মধ্যে

মুসলিম পঞ্জিকা

২বৈশাখ, ভাঃ ২৬ চৈত্র, ১৬ এপ্রিল, ২৮ রজব, ২ বহাগ, উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৪। সোমবার, অমাবস্যা দি ঘ ৭।২২ , সেহরী শেষ ৩।৫৩, ইফতার ৬।০২। মহাপুরুষ শ্রীঁ দামোদর দেবর তিরোভাব মহোৎসব পালন (অসম)

মাদককে 'না' বলুন।

যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়

লিপি

মাদক বিরোধী আন্দোলন

মানবিক সম্পর্কের মধ্যে দেবত্বায়ন প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ

গদাধর রানা

• জগৎ বৈচিত্র্যময় এবং পরিবর্তনশীল। জীবজগতের কতনা জীবেরই নিয়ত জন্ম হচ্ছে এবং সাথে সাথে কমবেশী বিলয়-ও ঘটে চলেছে। নিত্যনিয়তই এ হেন সৃষ্টি ও লয়ের মাঝেই তামাম ব্রহ্মান্ড তার অস্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করছে। আমরা জানি-জগতে বস্তুজ্ঞানের তিনটি সোপান আছে।(১)প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, পরস্পর পৃথক। (২) সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান। (৩) একটিমাত্র বস্তু আছে তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখছি। এই তৃতীয় সোপানের ভিত্তিতেই আমাদের সনাতন অদ্বৈত বলছে, "সর্বোহপি ব্যবহারস্তু ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ।"– এ জগতে সকল বস্তুর ব্যবহার ব্রহ্মের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। তাই ঐযে একটিমাত্র বস্তু এরই নাম ব্রহ্ম–ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। ব্রহ্মই হচ্ছে পূর্ণ দেবত্বের আধার। ব্রহ্মই অনন্ত এবং জীবাত্মার স্বরুপভূত– ব্রহ্মই ভগবান, ব্রহ্মই সৎ-বিদ-আনন্দ। বেদান্ত বা উপনিষদে বলা হয়েছে --জীবমাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তাহলে এতদিন আমরা জ্ঞাত আছি–বেদবেদান্তের সূত্র বা ভাব অনুসারে প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই দেবত্বের অমোঘ সত্তা বিদ্যমান। আবার এটাও সত্য, বেদান্ত বহু পূর্বেই এমনটিও বলেছে, ধর্ম সে যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, সব ধর্মই জ্ঞভাবাপন্ন মানুষের মহান্ চৈতন্যস্বরূপ দেবত্বকে বিকশিত করে– কারণ সঠিক জন্মলগ্ন হতেই মানুষের মধ্যে দেবত্ব অন্তর্নিহিত থেকেই যায়।

• তাছাড়াও, জীবের জীবনে আপনা হতেই একটি বিশেষ ভাব কাজ করে–যার নাম আধ্যাত্মিক জীবনের ভাব। এই জীবনের মূল কথাই হচ্ছে অন্তরে দৈবীভাবকে উপলব্ধি করা এবং তা জীবনে বিমূর্ত করা। সেজন্য বেদান্ত স্বীকার করে--জীব কখনই অখণ্ড ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। শুধু মায়ারূপ অজ্ঞানতাবশতঃ জীব আপনাকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ব'লে মনে করে।

• মানুষ নিয়তই ছুটে চলেছে বিপুল আগ্রহে এক অনন্ত অজানার সন্ধানে। এই অনন্ত সন্ধানে ছোটার ফলস্বরূপই সে একদিন বিশেষ এক আবেগে আপ্লুত হয়--এই আবেগই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। এ হেন ধর্মের আবেগের কেন্দ্রে দাঁড়িয়েই প্রতিটি মানুষ অন্তরস্থিত দেবতার দিকে তাকাতে বাধ্য হয়, যে দেবতা আছেন প্রতিটি মানুষেরই অন্তরে। তাই তো বেদান্ত বলছে একটামাত্র অখণ্ড বস্তুরই এই বিশ্বজুড়ে বিভিন্নরূপ। এই ভিত্তি হতেই প্রামান্য শাস্ত্র স্বীকার করেছে –

ব্রহ্মণ নঃ সর্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ
তস্মাদেতানি ব্রহ্মেব ভবন্তি ইতি অবধারয়েৎ।

-- অর্থাৎ পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সকল জীব উদ্ভূত হয়–সুতরাং জীবমাত্রই ব্রহ্ম–ইহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবে। এত কিছু অভিপ্রকাশ সত্বেও জীবব্রহ্ম বা জীবের মধ্যে দেবত্বভাবের নিশ্চিত অবস্থান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোনোদিনই খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। যদিও এটি প্রামান্য যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট অভিমত–এতে কোনো সন্দেহ নাই।

• জগতের মানুষের এই অস্পষ্ট/অস্বচ্ছ ধারনাকে সর্বপ্রথম এই পৃথিবীতে অবতাররূপে এসে স্বচ্ছ করলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। কালে কালে অনেক অবতারই এসেছেন এ পৃথিবীতে, আপন আপন সম্প্রদায়ভিত্তির ধর্মের ভাব ও বাণী প্রচার করেই তাঁরা ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং এক ব্যতিক্রমী প্রাণসম্পন্ন হয়ে সকলকে ছাড়িয়ে সবার উর্দ্ধে উঠে মানুষকেই দেবতাজ্ঞান করলেন। সহজ কথায় তিনি ঘোষণা করলেন–মানুষই দেবতা, দেবতা ছাড়া মানুষ আর কিছু নয়। তিনি প্রস্তরে বা মৃন্ময়ে প্রাণসঞ্চার করে দেখলেন অর্থাৎ মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করলেন। আবার অপরপক্ষে জগতের মাঝে দেব ও মানবের বিভেদহীনতা বা অভিন্নতা প্রমানের জন্য চিন্ময়ী মানবী সারদা মাকে দেখা আপন প্রজ্ঞাবলে পূজায় বা ধ্যানে দেবতায় রূপান্তরিত করে দেখলেন, যা পূর্বে এই পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি।

• "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"– সহজভাবে বলা এ এক বিরাট কথা--যা চণ্ডীদাস একদা বলেছিলেন। তাই মানুষই সব, তাকে বাদ দিয়ে এই বিশ্বের ধারণা অর্থহীন। অতল, এমনকি, ঈশ্বর ভাবনার প্রকাশ মানুষের জীবনভাবনা দিয়েই ব্যক্ত হয়। একমাত্র মানুষই, আর কেউ নয়, তার ইন্দ্রিয় দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে। ইন্দ্রিয়গোচর জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় ঈশ্বরের অনন্ত মাধুর্য। মানুষের আত্মানুভব ও আত্মজ্ঞানের আলোয় বিশ্বচরাচরে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেন ঈশ্বর। আপন গরিমাকে মানুষ যেদিন বুঝতে শিখল--সেদিন থেকেই জীবনের পথে পথে তার জয়যাত্রা। সেই যাত্রা আজও অব্যাহত। নিজেকে কতভাবেই আবিষ্কার করতে মানুষ এগিয়ে চলেছে। এমনই এক সুচারু নবতম ভাবনার পথে মানুষের হাঁটা শুরু হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাব স্পর্শে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলেছে, 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"– আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে। পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, পরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। এই সূত্রের অনুসারী হয়েই ঠাকুর সবার প্রথমেই জগৎকে আত্মতত্ব শ্রবণের নিমিত্ত উপদেশ দিলেন। নবযুগের অমোঘ সূচনালগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে বোঝাতে চাইলেন– তুমি মানুষ হ'লেও সিংহবিক্রম সম, তুমি ছোট নও। নতুনভাবে নব চেতনায় সংজ্ঞায়িত ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দিলেন। বললেন, মানুষ আর মান হুঁশ অর্থাৎ যে মান হুঁশ– সে-ই মানুষ। আত্মবোধ বা আত্মোপলব্ধিই মানুষের অভিজ্ঞান। প্রতি মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে আর এক মানুষ, তার দিব্যচিন্ময় সত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানুষ লোকায়ত, সর্বব্যপ্ত। সে ধনী-নির্ধন, পবিত্র-অপবিত্র, ফরসা-কালো, সে সংসারী-সন্ন্যাসী, নরনারী, ভালমন্দ, আনন্দিত-পীড়িত, সুখী-দুঃখী অনেক। অনেক তার পরিচয়। জগৎ জুড়ে তার উপস্থিতি। তার এই বিবিধ বহিরঙ্গের পরিয়টুকুই সব নয়। অন্তরংগে সে স্বরূপতঃ ভগবান, ঈশ্বর, শিব। তারই ভিতর নিয়ত চলেছে ঈশ্বরের লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের এই অন্তলোকের মহিমাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। প্রতিষ্ঠা দিতে হ'ল এজন্যই যে মানুষ নিজের দিব্যসত্তাটিকে ভুলে বসে আছে। তিনি বললেন মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানলাভ অথচ এ হেন সত্তাকে ভুলে যাওয়াটাই ভগবান লাভের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। চেতনারহিত হয়ে মানুষ কেবলই অতলে ডুবছে, আর স্বানুভবে ফিরতে পারছে না। সে তার অজান্তেই চারপাশে স্তূপীকৃত বেদনার পাহাড় তৈরি করছে। অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ কেঁদে উঠল সবার জন্য। তিনি সকল ভাবের মানুষকেই সঠিক পথ দেখিয়ে আলোর শিখরে পৌঁছে দিতে চাইলেন। ঈশত্বকে আড়াল করে লোকজীবনে নেমে এসে মানুষকে বুঝিয়ে দিলেন– মানুষকে ভালবেসেই মানুষ হয় ঈশ্বর। তখনই মানুষ বুঝবে যে কোন্‌টি দুঃখযন্ত্রণার কারণ, কোন্‌টি চিরন্তন আনন্দের আকর। কোন্‌টি সার, কোন্‌টি অসার। এমনি করেই তিনি আরো বললেন-- নিশ্চিতই সংসারী হতে হবে, তবে সংসারে থেকে যেটুকু করার দরকার তা করতে হবে, তবে তা যেন হয় নিষ্কামভাবে।

• চাই ঈশ্বরচিন্তা, তাঁর নামগুণগান ও নিজকর্ম। তিনি নিজে ঈশ্বর বৈ কিছু জানতেন না। তিনি স্বয়ং প্রেমময় ঈশ্বর হ'য়ে তাঁর বিভেদহীন অহৈতুকী প্রেমই মূলতঃ সকলকে ঈশ্বর-দৃষ্টিতে দেখেছে– এই জায়গাকেই ইহলৌকিক জগতে যেন তাঁর ঘটেছিল বিশ্বদৃষ্টিতে উত্তরণ– যদিও স্বয়ং তিনিই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তিনিই অনন্ত ঘনীভূত প্রেম, কীবা সগুণ নির্গুণ সকলই তিনি। তাই ঠাকুর যে স্বয়ং ঈশ্বর, তার মূলেও সত্যের ইংগিত আছে স্বামীজীর বাণীতে। প্রেমময় পরমেশ্বর ব'লেই সকলের প্রতি তাঁর অহৈতুকী ভালবাসা, সর্বলোকে তাঁর প্রেম ও করুণা। দগ্ধ বিভ্রান্ত মানুষকে আশ্রয় দেবার জন্য তিনি ব্যাকুল। জগতের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার পরই যেন তাঁর ছুটি। তাঁর কাছে ঈশ্বরবোধ যা কিছুই হোক, মানুষ অনেক বড়, আর সেই মানুষই ঈশ্বর। জীবের সেবাকেই জীবনের মহামন্ত্র মনে ক'রে তিনি প্রকট জীবন অতিবাহিত করে গেছন। সেজন্য শাস্ত্রে এক জায়গায় বলেছে –

যে ঈশ্বরকে ভালবাসে সে ধার্মিক
যে মানুষকে ভালবাসে সে ভগবান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেবার লক্ষ্যে মানুষকে ভালবেসেই সার্থক ভগবানে পরিণত হয়েছেন। এই জীবনের সম্পর্কেই তাঁর একান্ত অনুগত বৃহৎ আধার বা শক্তিস্বরূপ সন্তান যিনি নরেন্দ্রনাথ (ওরফে স্বামীজী) তাঁর বাণীতে আমরা কী দেখতে পাই? তিনি বলছেন, "After so much austerity, I have understood this so the real truth, God is present in every Jiva ; there is no other God besides that. Who serves Jiva, serves God in deed." অর্থাৎ "এত এত তপস্যার পরে আমি এই সত্যকেই জেনেছি যে ভগবান সর্বজীবে বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত আর অন্য কোনো ভগবান নাই। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিঝে ঈশ্বর।"

• আমরা প্রামাণ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জানতে পেরেছি-- শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ছিল সর্বানুস্যুত ব্রহ্মের অনুভব তাই তাঁর উপদেশের গভীর তাৎপর্য যুগে যুগেই বিদ্যমান।

তিনি এক চরমতম বিজ্ঞানী হয়ে জীবনে তাঁর বিভিন্ন সাধনার দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন-- ভগবান পরমাত্মারূপে সকল মানুষের মধ্যেই বিরাজ করছেন। মানুষ মন করলে সবার মধ্যে সম্পর্ককে পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিকরূপে নিশ্চিতই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

• এই হেন সকল অনুধ্যান দ্বারা খুব সহজেই প্রমাণিত হয়– এ পৃথিবীতে অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই সর্বপ্রথম মানবিক সম্পর্কের মধ্যে সার্থক দেবত্বায়ণ ঘটিয়েছেন। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো

ড. প্রসেনজিৎ সরকার

"পাতা ঝড়া দিন শেষ
চৈত্রের ও ছুটি।
নতুন পাতার সাথে খেলি
খুনশুটি গায়ে মেখে,
হাসি আর গাই।
নতুন বছরে
ভালো থেকো সাবাই।।"

বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। সমস্ত কিছুর মধ্যেই সে উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করে। আর বিষয়টা যখন নববর্ষ অর্থাৎ বছরের প্রারম্ভকে কেন্দ্র করে তখন তা উৎসবমুখর হয়ে উঠবে এ আর নতুন কী? 'পয়লা বৈশাখ' অর্থাৎ বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ 'নববর্ষ'। এই দিনটি আপামর বাঙালি মহাসমারোহে পালন করে থাকে। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ইংরেজি বছরের প্রতি ১৪ই এপ্রিল বা ১৫ই এপ্রিল পয়লা বৈশাখ পালিত হয়। এই দিনটি সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়। নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করার জন্য, নতুন গৃহে প্রবেশের জন্য বা যে কোনো শুভ কাজ করার জন্য বাঙালিরা এই দিনটিকে বিশেষ মান্যতা দিয়ে থাকে।

'নববর্ষ' হল বছরের শুরু। কিন্তু এই 'নববর্ষে'র শুরু কোথায় সে বিষয়ে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। এখন যেমন সাড়ম্বরে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে নববর্ষ পালিত হয় প্রথমের দিকে কিন্তু এমন ছিল না। তখনকার দিনের কৃষকরা পুরোপুরি ঋতুর উপর নির্ভরশীল হওয়ায় নববর্ষ পালিত হতে ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে।

মুঘল যুগে সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা মতে, কৃষিজাত দ্রব্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি পঞ্জিকা চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল। চান্দ্র বৎসর (৩৫৩ দিন) সৌর বৎসর অপেক্ষা ১১/১২ দিন কমে যায়। ফলস্বরূপ ঋতুগুলির সাথে কৃষিফলন ঠিক মিলতো না। চাষীরা অসময়ে খাজনা পরিশোধ করতে বেশ অসুবিধায় পড়ত। এ ব্যাপারে মুঘল সম্রাট আকবরের দৃষ্টি যায়। তিনি সুষ্ঠুভাবে খাজনা আদায়ের জন্য বর্ষপঞ্জির সংস্কার সাধন করেন। তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ্ ফতেহ্ উল্লাহ সিরাজি সৌর বছর এবং চান্দ্র বছরের উপর ভিত্তি করে নতুন করে বাংলা সনের নিয়ম প্রবর্তন করেন। ১৫৮৪ খ্রীঃ ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে সম্রাট আকবর হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জির প্রচলন করেন। তবে তিনি ২৯ বছর আগে তাঁর সিংহাসনে আরোহনের সময় (১৫৫৬ খ্রীঃ ৫ই নভেম্বর) থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। ৯৬৩ হিজরি সালের মুহরম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস, সেই হিসেবে বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস বা পয়লা বৈশাখকে নববর্ষ হিসেবে ধার্য করা হয়।

আবার কারো কারো মতে গৌড়ের (প্রাচীন বঙ্গদেশ) রাজা শশাঙ্ক বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন। অনুমান করা যায় জুলীয় বর্ষপঞ্জির ২০শে মার্চ (শনিবার) ৫৯৪ বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল।

বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জি হলে সৌর পঞ্জিকা ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৌরদিন গণনা শুরু হয়। গ্রেগরীয় সনের মতই বঙ্গাব্দেও ১২ মাসে এক বছর। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যের বার্ষিক অবস্থান অনুযায়ী ১২টি রাশিতে ভাগ করেছিলেন। আকাশে রাশি মন্ডলীতে সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে বঙ্গাব্দের মাসের হিসাব হয়ে থাকে। সূর্য যখন মেষ রাশিতে অবস্থান করে তখন বৈশাখ মাস হয়।

এবার আসি 'নববর্ষ' উদ্‌যাপনের কথায়। বছরের প্রথম দিনটি মহা-সমারোহে এবং বিপুল উৎসাহে পালিত হয়ে থাকে। বাংলার গ্রামীন এবং নাগরিক সমাজ জীবন তথা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় খুশিতে মেতে ওঠে এবং একসাথে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। অবশ্য অনেক আগে থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পুরো চৈত্রমাস জুড়েই চলতে থাকে বর্ষবরণকে উপলক্ষ্য করে নানা অনুষ্ঠান। চৈত্রমাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তি বা মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন পালিত হয় চড়ক পূজা বা শিবের উপাসনা।

নতুন বছরের সাথে বাঙালির কৃষি ও সাংস্কৃতিক যোগ নিবিড়। এদিন মানুষ ভোর ভোর ওঠে, স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পড়ে। মন্দিরে পূজা দিতে যায় বা অনেকে বাড়িতেই পূজার ব্যবস্থা করে থাকে। আত্মীয় স্বজনদের নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই এদিন থেকে তাদের ব্যবসায়িক হিসাবের নতুন খাতা অর্থাৎ 'হালখাতা'-র উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মঙ্গলদাত্রী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা করা হয়। খরিদ্দাররা তাদের বিগত বছরের ধার শোধ করে এবং দোকানদাররা তাদের খরিদ্দারদের বিভিন্ন রকম মিষ্টি সহযোগে আপ্যায়ণ করে থাকেন। এই সূত্রে দোকানদার এবং খরিদ্দারদের মধ্যে এক আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে।

সম্পাদক সমীপেষু

লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হয়

এই সংসারে লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হয়। আমরা যারা মহিলা তাদের ওপর অনেক চাপ আসে। সেই চাপটাকে সামাল দিয়েই এগিয়ে যাবার ভাবনাটা এগিয়ে নিয়ে যাই। একটা সমস্যা এসে যায়, তারও সমাধান থাকে। সমাধানের সেই পথটাকে খুঁজে নিতে হয়। আমি আমার জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি, আমার স্বামী প্রচুর পরিশ্রম করে। সাথে সাথে আমিও পরিশ্রম করি। আমার একটি পুত্র সন্তান রয়েছে, একটা কন্যা সন্তান রয়েছে। তাদের কথা ভেবে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পরিশ্রম করি। যাতে একটা সংসার আরো উজ্জ্বলময় ও আনন্দেতে ভরে ওঠে। এটাই তো সংসারের নিয়ম। এইভাবেই একটা সংসার চলে আসছে। একটা সংসার মানে একটা পরিবার। সেখানে যে মেলবন্ধনের কথাটা লেখা রয়েছে, সেই লেখাটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়াটাই হল আসল কাজ। এরই নাম যে সংসার। কিছুই তো হারিয়ে যায়না। আমরাই একটা সামান্য ভুলের জন্য অনেক কিছু হারিয়ে ফেলি, হারিয়ে সবার পর বোঝা যায় তার মূল্য কতখানি। একটা সংসার গঠনে সবার আগে দরকার ভালবাসার। ভালবাসাকে পাথেয় করেই এগিয়ে আসতে হবে। সংসার মানেই একটা সমস্যা। তাই বলে সেখান থেকে সরে যাওয়াটা, কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সমস্যা থাকবে, সেই সমস্যার সমাধানের জন্য লড়াই করতে হবে। একটা ভেঙ্গে যাওয়া সংসারকে আবার জোড়া লাগাতে হবে। এটাই যে সংসারের আসল কথা। আমি আমার স্বামী, দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে যাচ্ছি। একটা সংসার যেন ভালবাসায় ভরে থাকে। নামীদামী খাদ্য হয়ত খেতে পাইনা। তবে প্রতিদিন ডাল-ভাতটা পেট ভরে খাই। এর চেয়ে আর কী পাওনা থাকতে পারে। আমার সংসারটা তো ভালবাসায় রয়েছে। স্বামী হিসাবে তার কর্তব্য সে ঠিক পালন করে। স্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য আমি পালন করি। আমাদের মধ্যে কারোর ভালো মন্দর চাহিদা নেই। আমরা বেঁচে থাকতে চাই লড়াই করে। এটাই আমাদের আসল কথা। কি পেলাম, বা কি পেলাম না, তার হিসাব আমরা কোনোদিন করিনি। আর করবোও না। একটা বাড়ির নিচে আমাদের বসবাস/যেখানে লেখা রয়েছে আশার আলো/ভালাবাসায় গড়ে উঠেছে সম্পর্কের এই বন্ধন/যেখানে লড়াই করেই বেঁচে থাকা/কত যে আনন্দের/কত যে ভালো।

ডালিয়া নন্দী
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়